আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সৌন্দর্যচেতনা : রবীন্দ্রনন্দনতত্ত্বের আলোকে

পৃথা ঘোষ

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভাব আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের (১৮৬৪-তে) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-তে)। তাঁরা সমসাময়িক, সমমনস্কও। সৌন্দর্যচেতনার উন্মেষ তাঁদের জীবনে ভিন্ন এবং অভিযাত্রা পৃথক হলেও পরিশেষে তাঁরা একই উপলব্ধিতে উপনীত। রবীন্দ্রনাথ যেখানে পার্থিব জগৎ থেকে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যলোকের কথা বলেন, সেখানে এই সৌন্দর্যের বিকাশে বড় সহযোগিতা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের, অর্থাৎ মনের; পঞ্চেন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতায় তা সীমায়িত নয়। ব্রজেন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে দৃশ্যমান জগৎ ও জাগতিক মানুষ্যজীবনের সঙ্গে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই উপলব্ধি করেছেন সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা। কিন্তু সৌন্দর্যচেতনার গভীরতা ও ব্যাপ্তিতে কোনো সীমাবদ্ধতা তাঁর সৌন্দর্যপিপাসু মনকে প্রতিহত করেনি। তিনি কলা ও বিজ্ঞানের বহু বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং সেব্যাপারে তাঁর স্বীকৃতিও ছিল; কিন্তু মূলত তিনি একাধারে কবি এবং দার্শনিক। তাঁর 'The Quest Eternal' কাব্যের উৎকর্ষের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ সহ সেকালের পরিচিত সমস্ত মনীষীর প্রশংসা ও সমাদর লাভ করেছে। তাই তাঁর দর্শন শুধুই পার্থিবকে দেখা নয়, সৌন্দর্যের অন্তহীন অন্বেষণ। তাই এই দুজনের আন্তরিক সম্পর্ক কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিন্নমত হলেও আত্মীয়তায় অন্তরায় ঘটায়নি। আমরা এই স্বল্প পরিসর আলোচনায় এই আলোতেই তাঁদের সৌন্দর্যপিপাসু মনকে স্পর্শ করতে চেষ্টা করবো। আমাদের প্রেরণা হোক ব্রজেন্দ্রনাথের মনীষাকে স্বীকৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য কবিতা—যার অনুবাদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্বজ্জনের কাছে পৌঁছেছিল। ডঃ কালিদাস নাগ "ব্রজেন্দ্রনাথ শীল" শীর্ষক সেই কবিতার যথার্থ অনুবাদ করেছিলেন, যার প্রথমাংশ এইরূপ—

"On the inaccessible heights of knowledge
Thou art soaring in supreme majesty,
O thou Pilgrim,
In regions where ridges of self-realization
Embrace thy far-reaching vision; ...." [১]

শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। আশৈশব তাঁর শিক্ষাব্যবস্থা তাই অন্যরকম। সংস্কৃতির সঙ্গেও তাঁর আত্মীয়তা সহজাত। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে কৈশোরোত্তীর্ণ বয়সেই নিয়ে গিয়েছিলেন হিমালয়ে; পাঠ দিয়েছিলেন উপনিষদের। হিমালয়ের বিপুল বিস্তার দেখে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ বিভোর কিশোর রবীন্দ্রনাথ। এই প্রকৃতিচেতনা থেকেই রবীন্দ্রনাথ ওই বয়সে যে সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, তার সঙ্গে মিলেছিল তাঁর মানুষের প্রতি ভালোবাসা। মানুষ-প্রকৃতির এই মেলবন্ধনে ছিল না দেশকালের সীমার

বেড়াজাল। ছিল বিশ্বমানবতাবোধ। তাই তাঁর সমস্ত সৃষ্টির অধিপতি হলেন পরম সুন্দর মানুষ। এখানেই তাঁর সৌন্দর্যচেতনার অনন্যতা। তাঁর কাছে সেই সৌন্দর্যের আবেদন অনুচ্চ হলেও বাঙ্ময়। তিনি যেদেশেই ভ্রমণ করেছেন, তাঁর নান্দনিক মন সেখানেই খুঁজে নিয়েছে সুন্দরকে।

অন্যদিকে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মনে করছেন, যে নন্দনতত্ত্বের কোন কোন ক্ষেত্রে অনুভূতি ও কল্পনা, শিল্পের সহায়ক নয়। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যদিও নান্দনিক ও নৈতিক, সকল প্রকার কর্মের ক্ষেত্রেই আমাদের আবেগ ও অনুভূতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে; তৎসত্ত্বেও, তিনি দাবী করেছেন যে এই অনুভূতি ও আবেগ ছাড়াও আমাদের ভাব, ভাবনা, কল্পনা ও প্রচলিত সংস্কার সমানভাবে সক্রিয়। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হ'লো, তাঁর মতে শিল্পবিচারের মানদণ্ডে অনুভূতি ও আবেগের দ্বার রুদ্ধ হ'লেও, শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে এরা কখনোই ব্রাত্য নয়। আর এখানেই ব্রজেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনা ও রবীন্দ্রনন্দনতত্ত্ব হয়ে উঠেছে একে অপরের পরিপূরক।

রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ উভয়েই মনে করেন যে শিল্প বা সাহিত্য কখনোই জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ব্রজেন্দ্রনাথের মতে, শিল্প ও সাহিত্যের মূল উপাদান হ'লো জীবন সমীক্ষা বা Criticism of Life। তাই শিল্পের মূল্যায়নের যে মানদণ্ড, তা হলো সমগ্র ব্যক্তিজীবন। তিনি মনে করেন, কাব্য বা সাহিত্য যদি জীবন থেকে বিচ্যুত হয়, তাহলে তা শুধুমাত্র একটি আবয়বিক রূপ ধারণ করে, কিন্তু তার কোনো ব্যক্তিগত আবেদন থাকে না। এই প্রকার সাহিত্যসৃষ্টিকে তিনি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন ঋজু এবং স্পষ্টবক্তা। তাই ক্ষেত্রবিশেষে তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রসৃষ্টিকেও সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হননি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের রচনাতে ছিল কল্পনাশক্তি ও আবেগের প্রাধান্য। তাই ব্রজেন্দ্রনাথ মনে করেছেন যে 'প্রভাতসঙ্গীত' ও 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থদুটিতে কল্পনা ও আবেগ থাকলেও, সেখানে যথার্থভাবে জীবনের প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নেই। তিনি কবির 'প্রকৃতির পরিশোধ' নাটকটিকেও যান্ত্রিক বন্ধনের পরিমণ্ডলরূপে অভিহিত করেছেন, যেখানে শিল্পীর স্বাধীনতা ব্যাহত হয়েছে। এর থেকেই বোঝা যায়, যে ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর নান্দনিক বক্তব্যে কতটা দৃঢ় ছিলেন। শুধু তাই নয়, ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর 'The Neo-romantic Movement in Bengali Literature' শীর্ষক প্রবন্ধেও বিভিন্ন পাশ্চাত্য ও বাংলা কাব্যে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি প্রতিবিম্বিত হয়েছে। কোনো কোনো কাব্যে প্রত্যক্ষভাবেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব ও যুদ্ধের বিবরণও পাওয়া যায়। তাই শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব কখনোই সমাজ ও জীবন থেকে ভিন্ন নয়। তিনি অনায়াসেই 'The Quest Eternal'-এ লিখতে পারেন—

"When suddenly,
Before my gaze all fixed in rigid ecstasy
The solemn train
Stirred into life, and moved
To choral dance and strain!"[২]

শিল্পের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন যে, শিল্প হচ্ছে জীবনের প্রতিরূপ। তাই প্রত্যেক দেশের মানুষের জীবনধারা ও চিন্তাধারা অনুযায়ী তাদের শিল্পও স্বতন্ত্র। যেমন মিশরীয় সভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতা ভেদে উভয় দেশের শিল্প ও সংস্কৃতিও ভিন্ন, কারণ উভয়েরই উৎস হলো সেই দেশের জীবন ও সমাজ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আরও একটি দিক অবশ্যই দ্রষ্টব্য। তা হলো, যদিও ব্রজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের কাব্যরচনায় জীবনের সঙ্গে কোনো যথার্থ মেলবন্ধন খুঁজে পাননি, তৎসত্ত্বেও আমরা পরবর্তী সময়ের রবীন্দ্র সাহিত্য বিশ্লেষণ করলেই দেখি যে সেখানে সৌন্দর্য সৃষ্টির উৎসরূপে অভিহিত করা হয়েছে মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে অপরের হৃদয় এবং বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তাকে। এই আত্মীয়তা দ্বারা নিজেকে প্রসারিত করলেই নিজেকে ভালো করে চেনা যায়, বলে কবি মনে করেন। একেই বলে আত্মপ্রকাশ, যা প্রকৃতির মধ্যেও বিরাজমান। আবার, "পঞ্চভূত" গ্রন্থে তিনি লিখছেন—

> "মাকড়সা যেমন মাঝখানে থাকিয়া চারিদিকে জাল প্রসারিত করিতে থাকে, আমাদের কেন্দ্রবাসী আত্মা সেইরূপ চারিদিকের সহিত আত্মীয়তা-বন্ধন স্থাপনের জন্য ব্যস্ত আছে; ..... বসিয়া বসিয়া আত্মপরের মধ্যে সহস্র সেতু নির্মাণ করিতেছে। এই যে আমরা যাহাকে সৌন্দর্য বলি সেটা তাহার নিজের সৃষ্টি। সৌন্দর্য আত্মার সহিত জড়ের মাঝখানে সেতু।"[৩]

ব্রজেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য ও শিল্পভাবনাতেও পাই এই আত্মীয়তার কথা। সেই সঙ্গে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন মানুষের অনন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ওপর। ব্রজেন্দ্রনাথ মনে করেন, মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত জীবনদর্শনই হলো কাব্যবিচারের প্রধান মানদণ্ড। তাঁর মতে প্রত্যেক মানুষই চায় অনন্যতা; —যা তার ব্যক্তিত্বে আনে বৈচিত্র্য। আবার এই বৈচিত্র্যই প্রতিফলিত হয় শিল্পসৃষ্টিতে এবং মানুষের সৌন্দর্য-চেতনায়।

ব্রজেন্দ্রনাথের এই মতকে সমর্থন করে অবশ্যই বলা যায় যে শিল্প সর্বদাই ব্যক্তিগত অনুভবের ফসল। সে কারণেই যে কোন পরিচিত ঘটনা বা চরিত্র শিল্পীর সৃজনশৈলীর গুণে হয়ে ওঠে অনন্য ও অভিনব। এভাবেই মহাভারতের পরিচিত চরিত্র 'কর্ণ', 'অর্জুন', 'চিত্রাঙ্গদা' বা 'দ্রৌপদী' কবির লেখনীতে পায় অন্য মাত্রা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সমর্থন করেছেন। কবি তাই লিখছেন—

> "..... সেই সত্য যা রচিবে তুমি
> ঘটে যা তা সব সত্য নহে।
> কবি তব মনোভূমি রামের জনম স্থান
> অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"[৪]

এভাবেই ব্রজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনায় ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে মানবজীবন ও সমাজ। উভয়ের কাছেই গ্রহণযোগ্য হলো জীবন ও দর্শনের সামগ্রিক রূপ। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'The Quest Eternal'-এ যে নান্দনিক জগতের সন্ধান দিয়েছেন, সেখানে তিনি বার বার বিষয়কে সম্যকদৃষ্টি বা সামগ্রিকভাবে দেখার কথা বলেছেন

('Synoptic view of life')। তিনি মনে করেন যে আমাদের জীবন হলো একটি সামগ্রিক জীবন; অধ্যাপক সুধীরকুমার নন্দীর কথায়, "উপনিষদের ভূমা-আশ্রিত মহাজীবন।"[৩] এই পূর্ণ সমগ্রতার ধারণা একদিকে যেমন ব্রজেন্দ্রনাথকে শিল্প-সাধনায় উৎসাহিত করেছে, তেমনি তাঁর শিল্প সমালোচনাতেও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। এই সমগ্রতাটুকুই হলো কোনো ব্যক্তিত্বের অনন্যতার প্রকাশ। কেউ কেউ আবার মনে করেন যে এই সম্যক দর্শনের ফলশ্রুতিই হলো তত্ত্বের ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রনাথের এক ধরনের সম্যক পরিকল্পনা (Individual Scheme of Life)। ব্রজেন্দ্রনাথের এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে রয়েছে ইতিহাস, যেমন মানব অভিজ্ঞতাকে স্থান কালের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ করে দেখা হয়; দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে বিজ্ঞান ও দর্শন—যা কিনা কাল-নিরপেক্ষ এবং তৃতীয় পর্যায়ে পাই শিল্প ও ধর্মকে, যেখানে প্রাধান্য পায় রসোপলব্ধি। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এই সম্যক বা সামগ্রিক দর্শন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথও বহু ক্ষেত্রে এই সম্যক দর্শনের কথা বলেছেন। কবি মনে করেন যে গোলাপের আকারে, আয়তনে, তার সুষমায়। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরস্পর সামঞ্জস্যে বিশেষভাবে নির্দেশ করছে তার সমগ্রের মধ্যে পরিব্যাপ্ত এককে; সেই জন্যই গোলাপ আমাদের কাছে কেবল একটি তথ্যমাত্র নয়, তা সুন্দর। এ যেন এক প্রকার বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য।

তবে এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের মাধ্যমে সৌন্দর্যের রসাস্বাদন করতে গেলেও একটি যথার্থ সামঞ্জস্য ও সাযুজ্যের প্রয়োজন। তাই ব্রজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই সৌন্দর্যচেতনার ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও শৃঙ্খলাবোধকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ আকার-আশ্রয়ী তিন প্রকার শিল্পের কথা উল্লেখ করেছেন;— স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও অংকনশিল্প, —যাদের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট সুসংবদ্ধ পরিমাপ ও পদ্ধতি আছে বলে তিনি মনে করেন। এমনকি এই ত্রিবিধ শিল্পের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন যে সঙ্গীত, সেখানেও রয়েছে সুরসমন্বয়, স্বরমাধুর্য এবং গাণিতিক ছন্দোবদ্ধতা। এই গাণিতিক ছন্দোবদ্ধতার মাধ্যমেই শিল্পের পরিমিতিবোধ প্রকট হয়, যা থেকে সৃষ্টি হয় সুরসমন্বয় ও স্বরমাধুর্য।

রবীন্দ্রসৌন্দর্যভাবনাতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে শৃঙ্খলাবোধ ও পরিমিতিবোধ। তিনি এই প্রসঙ্গে তাঁর "জাপানযাত্রী" গ্রন্থে তেরো নম্বর পত্রে দুটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কবিতার উল্লেখ করেন। কবিতাদুটিতেই প্রকৃতির দুটি নির্দিষ্ট পরিচিত ছবির বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তার জন্য দীর্ঘ অনুচ্ছেদ, বহু বাক্য ও শব্দের প্রয়োজন হয়নি। তিনি কবিতাদুটির সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে শুধু বাকসংযম নয়, ভাবসংযমের কথাও বলেছেন। তাঁর মতে, নিজের ভাষা, ভাব ও আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করলে সৌন্দর্যোপলব্ধি আরও গভীর হয়। এর মধ্যেই নিহিত থাকে সৌন্দর্যের স্বচ্ছ দৃশ্যমানতা, যেখানে সৌন্দর্য এসেছে প্রতীকী হয়ে, যা সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক ইঙ্গিতময়। এই প্রসঙ্গে কবি মনে করেন যে, যা যথার্থ সুন্দর, তার চারিদিকে মস্ত একটা বিরলতার অবকাশ থাকা চাই। তিনি মনে করেন, প্রকৃত সৌন্দর্যবোধ একটি সাধনার মতো; তা মানুষের মনকে স্বার্থ ও বস্তুর সংঘাত থেকে রক্ষা করে। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন শরীর ও মনকে একান্ত সংযত করে নিরাসক্ত প্রশান্ত মনে সৌন্দর্যকে নিজের প্রকৃতির মধ্যে গ্রহণ করা। তিনি এও মনে করেন যে সৌন্দর্যবোধ হলো স্বার্থনিরপেক্ষ।

শুধু তাই নয়, এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনন্দনতত্ত্বের আরও একটি দিক তুলে ধরা খুবই জরুরী, তা হলো আত্মসংযম। কবির মতে যথার্থ সৌন্দর্যরস আহরণ করতে হলে গোড়ায় তার ভিত স্থাপন করা দরকার সংযমের মাধ্যমেই। তিনি মনে করেন, যথার্থ রসগ্রহণের অধিকারী হতে হ'লে গোড়ায় কঠিন চাষের প্রয়োজন। তাই প্রথম বয়সেই ব্রহ্মচর্যপালন করে নিয়মে সংযমে জীবনকে গড়ে তুলতে হবে। তাঁর মতে, ভিত্তমাত্রই শক্ত হওয়া প্রয়োজন, না হলে তা অপর কোনো কিছুর আশ্রয় হতে পারে না। মানুষের শরীর যতই নরম হোক না কেন, তা যদি শক্ত হাড়ের ওপর না থাকতো, তাহলে তা নিশ্চয়ই একটি মাংসপিণ্ডরূপে পরিণত হতো; তার কোনো আকার বা সৌন্দর্য থাকতো না। তিনি "সৌন্দর্যবোধ" প্রবন্ধে লিখছেন—

> "এই যে শক্ত জিনিস, ইহাই সংযম। ইহার মধ্যে বিচার আছে, বল আছে, ত্যাগ আছে; ইহার মধ্যে নির্মম দৃঢ়তা আছে। ... সৌন্দর্যকে পূরামাত্রায় ভোগ করিতে গেলে এই সংযমের প্রয়োজন।"*

তিনি এই সংযম ও সৌন্দর্যের মেলবন্ধন ব্যাখ্যা করেছেন ভারী সুন্দর একটি উদাহরণের সাহায্যে। তিনি বলছেন যে সমস্ত ঘরে আগুন লাগিয়ে গন্ধপ্রদীপ জ্বালানো যায় না। খুব দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তাই আগুন দিয়ে ঘর আলোকিত করতে হলে সর্বদা তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়, যাতে তা আলো জ্বালাতে গিয়ে সব কিছু ধ্বংস না করে ফেলে। প্রবৃত্তি সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। প্রবৃত্তিকে যদি পুরোমাত্রায় জ্বলে উঠতে দিই, তবে তা সৌন্দর্যকে মাড়িয়ে তুলবে না, তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মে পরিণত করবে। তাই প্রকৃত সৌন্দর্যের ভিত্তি হলো সংযম।

তবে এর থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লে ভুল হবে যে ব্রজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মতে প্রকৃত সৌন্দর্যের মধ্যে নিহিত আছে কাঠিন্য ও রূঢ়তা। তাঁরা পরিমিতিবোধ ও শৃঙ্খলাবোধকে গুরুত্ব দিলেও তার অন্তরের আনন্দ ও প্রকাশকে কিন্তু উপেক্ষা করতে পারেননি। ব্রজেন্দ্রনাথ মনে করেন যে শিল্পের স্বরূপলক্ষণ হলো আনন্দ অর্জন। এই আনন্দের ভিত্তিতেই ব্রজেন্দ্রনাথ চারুকলা ও কারুকলার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে কারুকলার মধ্যে আনন্দ নেই, তা আছে চারুকলাতে। তাই আমরা কোনো ছবি দেখলে, গান শুনলে অথবা কবিতা পড়লে আনন্দ অনুভব করি।

রবীন্দ্রনন্দনতত্ত্বেও পাই এই আনন্দতত্ত্বের কথা। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় কবির নবীন বয়সে সদর স্ট্রীটে সূর্যোদয়ের সেই অভূতপূর্ব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার কথা; যার প্রতিফলন ঘটে তাঁর "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতায়। তিনি যখন বলছেন—

> "আজি এ প্রভাতে রবির কর
> কেমনে পশিল প্রাণের পর ..."†

—তখন প্রতিদিনের সূর্যোদয় তাঁর কাছে নিয়ে আসে এক অনন্য আবেদন। তখন সাধারণ মানুষ, তাদের কাজকর্ম এবং জগতের অতি তুচ্ছ বস্তুও কবির চিত্তে অনন্য সাধারণ হয়ে এক অপূর্ব সৌন্দর্য ও আনন্দের ঢেউ তোলে। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য তাঁর হৃদয়ে স্পন্দিত হয়ে যেন এক বিপুল সৌন্দর্যের বিস্তার করে। তিনি যখন বলছেন—

"ভাঙ ভাঙ ভাঙ কারা, আঘাতে আঘাত কর,
ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখি
এসেছে রবির কর।"*

—তখন তাঁর সৌন্দর্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ অন্তর সমস্ত অন্ধকার কারাগার থেকে মুক্তির আহ্বান শুনতে পায়। সৌন্দর্য এখানে আনন্দ ও মুক্তির মূর্ত রূপ। সূর্য তো প্রতিদিনই উদয় হয়; কিন্তু সেই প্রভাতে যে সূর্যোদয়ের অভিঘাতে কবিচিত্ত উদ্বেলিত হয়, সেটা তাঁরই নান্দনিক হৃদয়ের আবিষ্কার।

আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবি মনে করেন যে সৌন্দর্যের আনন্দ, নিভৃত একান্তভাবে অনুভব করার আনন্দ। ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে তিনি তাঁর কয়েকজন অতিথিকে নিয়ে বিকেলবেলা বাঁধের কাছে সূর্যাস্ত দেখতে যাওয়ার কথা বলেছেন। যখন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে, সঙ্গে শেষ বিকেলের সূর্যের আলোক-রশ্মি, তখন মুগ্ধ কবি-হৃদয় বলে ওঠে—'কি সুন্দর'! সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সহযোগীরাও কবিকে উচ্চারিত সমর্থন জানায়। এখানেই ভঙ্গ হয় সৌন্দর্যের আনন্দ ও মগ্নতা। কবি মনে মনে ঠিক করেন, এরপর প্রকৃতির কাছে যখন আসবেন, কাউকে আর সঙ্গে আনবেন না। সৌন্দর্য চেতনার উপলব্ধিতে একটা নিভৃত একান্ত ভূমিকাও আছে; আর সেখান থেকেই পাওয়া যায় প্রকৃত আনন্দ।

এই আনন্দ-আহরণই সৌন্দর্যচেতনার প্রধান নির্যাস বলে ব্রজেন্দ্রনাথও মনে করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সৌন্দর্য উপলব্ধির বিভিন্ন স্তরের কথাও ব্রজেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শিল্পের ত্রিতত্ত্বের ধারণার কথা বলেন। প্রথম তত্ত্ব হলো শিল্পবোধের তত্ত্ব। এই স্তরে শিল্প ক্ষণিক কালের জন্য আমাদের কাছে আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। দ্বিতীয় তত্ত্বে তিনি ক্ষণিক আনন্দের উত্তরণের কথা বলছেন। সেখানে আনন্দ হয়ে উঠছে সীমাহীন, কালাতীত। আর তৃতীয় তত্ত্ব বা স্তরে যুক্ত হচ্ছে আত্মা। সেই স্তরে উপজীব্য ব্রহ্মানন্দের সামীপ্য ও সাযুজ্য লাভই হলো শিল্পের ধর্ম। কিন্তু সেই সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে ভারতীয় দর্শনানুসারে ব্রহ্মকে কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে নিরূপণ করা যায় না। তাই তাঁর থেকে লব্ধ শিল্পানন্দও হয়ে যায় অনির্দিষ্ট ও অসংজ্ঞেয়। ব্রজেন্দ্রনাথ স্বয়ং শিল্পের এই অসংজ্ঞেয়তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। এই অসংজ্ঞেয়তাকে রবীন্দ্রনাথও অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি তাই শিল্পকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে তাকে 'মায়া' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু বস্তুতপক্ষে ব্রজেন্দ্রনাথের শিল্প-ধারণা ও রবীন্দ্রনাথের মায়াধারণার মধ্যে কোনো গুণগত ভেদ নেই।

সেই সঙ্গে এও লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-ভাবনায় মানুষ কোনো জৈবিক প্রাণীও নয়, কোনো কৃত্রিম জীবও নয়, সে এক বিরাট আত্মা। এই তত্ত্বই উঠে এসেছে তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যে; যেখানে চিত্রাঙ্গদা দেবতার বরে প্রাপ্ত রূপৈশ্বর্য বা কৃত্রিম সৌন্দর্য নয়। অর্জুনকে জয় করছে আপন চারিত্রিক ও মানবিক গুণে—যা আত্মশক্তিতে আলোকিত। ভোগের সমস্ত ক্ষণিকতা ও ব্যর্থতাকে অতিক্রম করে সৌন্দর্যের একটি অসীম মুক্ত রূপ আছে,—যে রূপটিকে সত্যভাবে দেখতে পেলে ভোগের লালসা আপনি ক্ষয় হয়ে যায়। এটাই চিত্রাঙ্গদার মূল বর্ণনীয় বিষয় বলে মনে করেছেন বিশিষ্ট রবীন্দ্র সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুধীরকুমার নন্দী মনে করেন যে রবীন্দ্রসৌন্দর্যচেতনায় নিহিত আছে একপ্রকার subjectivism বা ব্যক্তি সাপেক্ষিকতা। তাই কবির মতে গোলাপে মানুষ যে সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে, তা গোলাপ ফুলে নেই। তা আছে মানুষের অনুভূতিতে। সৌন্দর্যের এই ব্যক্তি-সাপেক্ষিক অস্তিত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন স্বয়ং। কবি মনে করেন যে শিল্পের সত্য হলো রূপাশ্রয়ী; এ সত্য রূপের truth, বস্তুগত বা বাস্তব সত্য সুন্দর নয়। বাস্তব যখন শিল্পীর দেওয়া সাজপোষাক পরে আসে, তখনই তাকে আমরা 'সুন্দর' বলি। এই রূপের মাধ্যমেই শিল্পী-মানসে তার প্রতিক্রিয়া জানতে পারি, বুঝতে পারি। যাঁর সৌন্দর্যবোধ যত উচ্চগ্রামে বাঁধা, তার মানস প্রতিক্রিয়া ততই বিচিত্র, ততই বর্ণবহুল; —তাঁর দেওয়া রূপ ততই ঐশ্বর্যবান, ততই সুন্দর। সে কারণেই, একই সূর্যোদয় একেক শিল্পীকে একেক বর্ণের দ্যুতিতে অনুপ্রাণিত করে।

অপরদিকে অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রসৌন্দর্যচেতনার আরও একটি দিক তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, শুধু চোখের দৃষ্টি নয়, তার পেছনে মনের দৃষ্টির যোগান না থাকলে সৌন্দর্যকে বড় করে দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই প্রসঙ্গে সৌন্দর্য আহরণের ক্ষেত্রে মনের বিভিন্ন স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। কেবল বুদ্ধি দিয়ে, বিচার দিয়ে যতটুকু দেখি, তার সঙ্গে হৃদয় যোগ দিলে ক্ষেত্র আরও বেড়ে যায়; ধর্মবুদ্ধি যোগ দিলে আরও অনেক দূর চোখে পড়ে; অন্তশ্চক্ষু খুলে গেলে আর সীমা পাওয়া যায় না। ব্রজেন্দ্রনাথের মতো রবীন্দ্রনাথের কাছেও এখানে সৌন্দর্যের আনন্দ তখন অসীম। এক্ষেত্রে মূল কথা হলো, আমাদের চোখের দৃষ্টি প্রতারিত করে; তাই প্রকৃত সৌন্দর্য ধরা দেয় মনের দৃষ্টি দিয়েই। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের "নিষ্ফল প্রয়াস" কবিতাতেও কবি তাই বলছেন—

"দেখ শুধু ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন;
রূপ নাহি ধরা দেয়—বৃথা সে প্রয়াস।"[৯]

তাঁর 'রাজা' নাটক ও 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যেও পাই তারই প্রতিধ্বনি—যেখানে ইন্দ্রিয়সৌন্দর্য নয়, অন্তরের সৌন্দর্যই প্রকৃত উপলব্ধ। এ রূপ অনির্বচনীয়।

শুধু তাই নয়, যেখানে সৌন্দর্য হয়ে উঠেছে ইন্দ্রিয় নয়, আত্মোপলব্ধির বিষয়—সেখানে সৌন্দর্যের উদ্দেশ্য হয়ে যায় মানবমুখী। আর এখানেই মিলেমিশে মূর্ত হয় ব্রজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনা কারণ উভয়ের কাছেই 'সুন্দর' ও 'মঙ্গল' সেখানে সমার্থক। এক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রনাথ সৌন্দর্যভাবনার বিভিন্ন পর্যায়ের কথা বলেছেন। তাঁর মতে শিল্পের মূল্যায়ন হবে সমষ্টি মননের দ্বারা, যেখানে প্রথম পর্যায়ে কিছু ব্যক্তির সমষ্টিগত মতামত গৃহীত হয়। সেখানে হয়তোবা যৌক্তিক শৃঙ্খলারও অভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে এই সমষ্টি হয়ে ওঠে অনেক সুসংহত, সেখানে থাকে ঐতিহ্যগত বন্ধন। তৃতীয় পর্যায়ে এই সমষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয় ধর্ম। এই ধর্ম ক্রমে আর কোনো ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। তাই শেষ পর্যায়ে এই ধর্ম হয়ে ওঠে বিশ্বমানবতায় উদ্বুদ্ধ। এই পর্যায়ে ব্যক্তিমন বিশ্বমানবতার শরিক হয়। সেখানে বিশ্বের সকল মানুষের সার্বিক মননধর্মই যুক্ত হয় ব্যক্তিমনের সঙ্গে। একে ব্রজেন্দ্রনাথ

বলছেন 'Race-mind'। আর এখানেই শিল্প ও সৌন্দর্য হয়ে ওঠে মানবমুখী। তিনি 'The Quest Eternal'-এও এভাবেই বলছেন বিশ্বমানবতার কথা—

"Thee nothing human doth displease,
For Thou hast not disdained to wear
The human face!
Thy Muses, graces, charities,
Are human mysteries;
Thou tastest of the cup from which Thou freely
Serv'st man's race!"[১০]

শুধু মানবমুখীই নয়, ব্রজেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য ও শিল্পভাবনা এখানে হয়ে উঠেছে কল্যাণমুখী। তিনি মনে করছেন, শিল্পের উদ্দেশ্য হবে সমাজ-কল্যাণ কারণ শিল্পের মধ্যেই নিহিত আছে শুভ সাধনের শক্তি; যা কিনা দেশ ও সমাজভেদে প্রভাবিত করে মানুষকে। তাই শুধু শিল্পের জন্য শিল্প (Art for art's sake) নয়। শিল্প সৃষ্টি হবে মানব সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঙ্গ; যা মানব কল্যাণে নিযুক্ত হবে। তাই প্রত্যেক শিল্পসৃষ্টির মধ্যে থাকবে শুধু নান্দনিক নয়, নৈতিক মূল্যও; সেখানে থাকবে 'সুন্দর' ও 'মঙ্গলে'র যথার্থ মেলবন্ধন।

রবীন্দ্রনন্দনতত্ত্বও সমর্থন করে এই মেলবন্ধন। তাই তাঁর কাছে সৌন্দর্য এক প্রকার শোভনতা, কোনো প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার মাধ্যম নয়। কবি বলছেন যে ক্ষুধার্ত হলেও আমরা পশুর মতো বা রাক্ষসের মতো যেমন তেমন করে খাদ্য গ্রহণ করতে পারি না। এই শোভনতাটুকু না থাকলে খাবার প্রবৃত্তিই চলে যায়। সৌন্দর্যই আমাদের শেখায় প্রবৃত্তিকে সংযত করতে। এ সৌন্দর্য একদিকে যেমন ইন্দ্রিয় বিলাসী রূপ থেকে ভিন্ন, অপরদিকে তা বিজ্ঞানীর তথ্য হতেও ভিন্ন; কারণ T.S. Elliot-এর মতো রবীন্দ্রনাথও মনে করেন যে বাহ্যিক রূপ বা তথ্যে পাওয়া যায় খণ্ডিত সত্যকে। প্রকৃত সত্য নিহিত আছে প্রকৃতি ও মানুষের যথার্থ সমন্বয়ে, যেখানে প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানব কল্যাণ।

এভাবেই রবীন্দ্রনাথের এই আত্মস্থ সৌন্দর্যচেতনা চিরকাল মর্যাদা দিয়েছে প্রকৃতি ও মানুষের স্বাভাবিক বিকাশকে। তাই পুত্র রথীন্দ্রনাথ যখন আম বা পেয়ারা গাছের স্বাভাবিক বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে লতানে গাছের রূপ দেন, তখন তা রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেননি কারণ তা তাদের স্বভাববিরুদ্ধ এবং স্বাভাবিক বিকাশের পরিপন্থী। তাই তা নিষ্ঠুরতাও বটে। সেজন্যই তাঁর "শেষ সপ্তক" কাব্যগ্রন্থের "আমার ফুলবাগানের ফুলগুলিকে" কবিতায় রবীন্দ্রনাথও দেখিয়েছেন যে, প্রকৃতির কাননে স্বাভাবিক বিকাশে যে বিচিত্র সুন্দর ফুল ফুটেছে, তাকে তিনি তোঁড়ায় বেঁধে উপভোগ করতে চান না; প্রকৃতির কাননের বিন্যাসে, বৈচিত্র্যে সেই পুষ্প-সুষমাকে মুক্ত চিত্তে উপভোগ করতে চান।

এভাবেই রবীন্দ্রভাবনায় বারবার জয়ী হয়েছে মঙ্গলময় সৌন্দর্য, যেখানে তা ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধে, কল্যাণমুখী। বস্তুত সৌন্দর্য যেখানেই পরিণতি লাভ করেছে, সেখানেই সে আপনাকে প্রগল্‌ভতামুক্ত করেছে। আর সেখানেই ফুল আপনার বর্ণগন্ধের বাহুল্যকে গূঢ়তর মাধুর্যে পরিণত করেছে। — সেই পরিণতিতেই সৌন্দর্যের সঙ্গে মঙ্গল একাত্ম হয়ে উঠেছে। সৌন্দর্য

ও মঙ্গলের এই মিলন যে দেখেছে, সে ভোগবিলাসের সঙ্গে সৌন্দর্যকে কখনোই একাত্ম করেনি। তাঁর মতে, ভোগীর বিলাসভবনের স্থাপত্য সৌন্দর্য নয়, দুর্গম গিরিশিখরের দেবালয় যুগে যুগে স্মরণীয়,— কারণ সেখানে সৌন্দর্যের সঙ্গে যুক্ত মঙ্গলের ধারণা।

এখানেই সার্থক ব্রজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনা; কারণ উভয়ের মূল ও শেষ কথা হলো মানবতা। উভয়ের কাছেই মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হলো, মানুষ সৃষ্টিকর্তা। মানুষ সৃষ্টি করে আত্মার প্রেরণায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ বাহ্যপ্রকৃতির তথ্যরাজ্যের সীমা অতিক্রম করে আত্মার চরম সম্বন্ধে নিয়ে যায়, যা সৌন্দর্যের সম্বন্ধ, কল্যাণের সম্বন্ধ, প্রেমের সম্বন্ধ, তারই মধ্যে; সেইখানেই মানুষের সৃষ্টির রাজ্য।

পরিশেষে জানাই ব্রজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের এই সৌন্দর্যচেতনা যে শুধুমাত্র স্বতন্ত্র, মঙ্গলময় ও মানবতা-কেন্দ্রিক, তাই নয়, আজকের যুগেও তা বড়ই প্রাসঙ্গিক। আমরা জানি যে, সৌন্দর্যের অস্তিত্ব অন্তর্লোকের অনুভবে। একালের মানুষ যতই পার্থিব প্রাপ্তির প্রত্যাশায় উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে বেড়াক না কেন, একটু বর্ণ, একটু গন্ধ তার কাছেও পৌঁছোয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় যেমন বলেছেন, যারা সারাক্ষণ চোখ রাঙিয়ে অন্ধ হয়ে গেছে, তাদের নাকের কাছে তুলে ধরো ফুলের একটু গন্ধ। তিনি বলছেন, ছেঁড়া খোড়া টুকরো রঙে নয়, সারা দেশ জুড়ে আস্ত একটা ছবি টাঙানোয় মন দাও। শিল্পী যামিনী রায়ও তাই তাঁর আশ্চর্য লোকায়ত শিল্পের অনেক প্রতিলিপি রচনা করে সেগুলি নিতান্ত সাধারণ মানুষেরও আয়ত্তের মূল্যে বিক্রী করার চেষ্টা করেছেন;— সারাদিন পরিশ্রমের পর যাতে কর্মক্লান্ত মানুষটি দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বিবর্ণ নয়, বর্ণময়কে দেখতে পান, এবং পরদিনের জীবনসংগ্রামে যুঝবার মতো রসদ খুঁজে পান।

আজকাল নিতান্ত ভারী শিল্পের ইস্পাত কারখানাতেও বা যন্ত্রেও নানারঙের প্রলেপ দেবার কথা ভাবছেন কর্তৃপক্ষ, যাতে যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্লান্তিকর পরিণতি আমাদের ক্লিষ্ট না করে। আজকাল সারা বিশ্বেই নগরায়ণের সঙ্গে সৌন্দর্যায়নের সম্পর্ককে অপরিহার্য হিসেবে মান্য করা হয়। এটা শুধু দৃষ্টিনন্দন নয়, এটা সুস্থ জীবনের পক্ষেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সৌন্দর্যায়ন আমাদের জীবনযাত্রাকে রমণীয় করে তোলে। তাই দেখি উন্মুক্ত আকাশের নীচে ভাস্কর্য বা দেওয়াল গাত্রে বহুবর্ণের মুরাল এবং বাসগৃহের সুন্দর নক্সা; — এটাও আজকে প্রয়োজনীয় বলেই আদৃত হচ্ছে।

এছাড়াও একালে শিল্পায়নের সঙ্গে সৌন্দর্যায়নের অনিবার্য সম্পর্কে পরিবেশকেও মিলিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। সেই জন্যেই স্থাপত্য শিল্প ও মানানসই পরিবেশ রচনার ক্ষেত্রে এত নিত্য নতুন ভাবনার গুরুত্ব। এটা শুধু পার্থিব চাহিদাকে মেটায় না, পৃথিবীকে সুন্দর করে। সেকারণেই আজকাল যারা নতুন কারখানার পত্তন করছেন, তাদেরকেও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হচ্ছে যাতে একটু সবুজ, একটু ফুলের বাগান, ছায়াদায়ী বৃক্ষ বা নানারঙের শেড্ দিয়ে কারখানা সাজিয়ে তোলা যায়, যেখানে অধিকাংশ কর্মীর জীবনের বেশিরভাগটাই কাটে। তার গৃহ যেমন বাসযোগ্য, তেমনই কর্মক্ষেত্রও বাসযোগ্য হওয়া উচিত। সেজন্যই town and country planning বিষয়টি সারা বিশ্বেই আজকাল বিশদ চর্চায়—এবং এই সার্বিক ব্যাপ্ত

মানবজীবনের সৌন্দর্যবোধই সন্ধান করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। তাঁদের কবিতায়, চিঠিপত্রে ও বিভিন্ন রচনাতেও পাই তারই বহুবিধ বিন্যাস ও বিকাশ।

—এখানেই ব্রজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের কবি ও সৌন্দর্যদর্শনে ইতিহাস ও আবেগ এক বিন্দুতে এসে মিলেছে। সেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে মিলে গেছে সমানতালে। তাই ব্রজেন্দ্রনাথ লিখছেন—

"O Human O Humani
Unbind thyself,
And reel
Learn :
Psyche's curse is annulled,
And Prometheus has unbound himself ..."[১১]

রবীন্দ্রসাহিত্যেও যেন আমরা পাই তার প্রতিধ্বনি—

"আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া ..."[১২]

আবার, অন্যদিকে দেখি যে, সবাই জানে, 'ভোরবেলার ভৈরবী রাগ গাইতে হয়', কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুভূতির আবেগ থেকে বলছেন 'ভৈরবী গাইলেই ভোর হয়'।

একইভাবে আমরা দেখি যে শিল্প ও সুন্দরকে নিয়েই যেন ব্রজেন্দ্রনাথের 'The Quest Eternal', অর্থাৎ অনিঃশেষ অন্বেষণ; আর তাই তাই কাব্যগ্রন্থেরই শেষ অংশে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির সঙ্গে সুর মিলিয়েই যেন ব্রজেন্দ্রনাথ লিখছেন—

'Twas break of dawn: I woke
upon The reel
Where I had dreamt; the tide
was slowly rising ..."[১৩]

—যেন মনে হয় একই উচ্চারণ, কিন্তু উৎসের আবেগে ভিন্ন। এখানেই ব্রজেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনা ও রবীন্দ্রনন্দনতত্ত্ব সার্থক ও স্বতন্ত্র।

উল্লেখপঞ্জী

১. "The Greatest Savant of India", Acharya Brajendranath Seal (1864-1938), A Tribute, Edited by Haripada Mondal শীর্ষক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত অংশবিশেষ, পৃ. ৮।
২. "The Quest Eternal", Brajendranath Seal, পৃ. ১৩।
৩. "পঞ্চভূত", রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ৩১।
৪. "ভাষা ও ছন্দ", "সঞ্চয়িতা ২" (অগ্রন্থিত), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ১২৬।
৫. "নন্দনতত্ত্ব", সুধীরকুমার নন্দী, পৃ. ১৮৫।